

আর-রাহীকুল মাখতুম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সৌভাগ্যময় জন্ম এবং পবিত্র জীবনের চল্লিশ বছর (المَوْلِدُ وَأَرْبَعُونَ عَامًا قَبْلَ النُّبُوَّةِ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

ক্বাবাহ গৃহ পুনঃ নির্মাণ এবং হজরে আসওয়াদ সম্পর্কিত বিবাদ মীমাংসা (بِنَاءُ الْكَعْبَةِ وَقَضِيَّةُ التَّحْكِيمِ):

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন পঁয়ত্রিশ বছরে পদার্পণ করেন তখন কুরাইশগণ ক্বাবাহ গৃহের পুনঃনির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। কারণ, ক্বাবাহ গৃহের স্থানটি চতুর্দিকে দেয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিল মাত্র। দেয়ালের উপর কোন ছাদ ছিল না। এ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু সংখ্যক চোর এর মধ্যে প্রবেশ করে রক্ষিত বহু মূল্যবান সম্পদ এবং অলঙ্কারাদি চুরি করে নিয়ে যায়। ইসমাঈল (আঃ)-এর আমল হতেই এ ঘরের উচ্চতা ছিল ৯ হাত।

গৃহটি বহু পূর্বে নির্মিত হওয়ার কারণে দেয়ালগুলোতে ফাটল সৃষ্টি হয়ে যে কোন মুহূর্তে তা ভেঙ্গে পড়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া সেই বছরেই মক্কা প্লাবিত হয়ে যাওয়ার কারণে ক্বাবাহ মুখী জলধারা সৃষ্টি হয়েছিল। তাছাড়া প্রবাহিত হওয়ায় ক্বাবাহ গৃহের দেয়ালের চরম অবনতি ঘটে এবং যে কোন মুহূর্তে তা ধ্বসে পড়ার আশঙ্কা ঘনীভূত হয়ে ওঠে। এমন এক নাজুক অবস্থার প্রেক্ষাপটে কুরাইশগণ সংকল্পবদ্ধ হলেন ক্বাবাহ গৃহের স্থান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে তা পুনঃনির্মাণের জন্য।

ক্বাবাহ গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে সকল গোত্রের কুরাইশগণ একত্রিত হয়ে সম্মিলিতভাবে কতিপয় নীতি নির্ধারণ করে নিলেন। সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমেঃ ক্বাবাহ গৃহ নির্মাণ করতে গিয়ে শুধুমাত্র বৈধ অর্থ-সম্পদ (হালাল) ব্যবহার করা হবে। এতে বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ, সুদের অর্থ এবং হক নষ্ট করে সংগৃহীত হয়েছে এমন কোন অর্থ নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা চলবে না। এ সকল নীতির প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন করে নির্মাণ কাজ আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা হল।

নতুন ইমারত তৈরির জন্য পুরাতন ইমারত ভেঙ্গে ফেলা প্রয়োজন। কিন্তু আল্লাহর ঘর ভেঙ্গে ফেলার কাজে হাত দিতে কারো সাহস হচ্ছে না, অবশেষে ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ মাখযুমী সর্বপ্রথম ভাঙ্গার কাজে হাত দিলেন এবং অন্যেরা ভীত-সম্ভ্রান্ত চিত্তে তা প্রত্যক্ষ করতে থাকলেন। কিন্তু কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলার পরও যখন তাঁরা দেখলেন যে তাঁর উপর কোন বিপদ আপদ আসছে না তখন সকলেই ভাঙ্গার কাজে অংশ গ্রহণ করলেন। যখন ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত্তি পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলা হল তখন নির্মাণ কাজ শুরু হল। প্রত্যেক গোত্র যাতে নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে তজ্জন্য কোন্ গোত্র কোন্ অংশ নির্মাণ করবেন পূর্বাঙ্কেই তা নির্ধারণ করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে প্রত্যেক গোত্রই ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রস্তর সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। বাকূম নামক একজন রুমীয় মিস্ত্রির তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছিল। নির্মাণ কাজ যখন কৃষ্ণ প্রস্তরের স্থান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল তখন নতুনভাবে এক সমস্যার সৃষ্টি হল। সমস্যাটি হল ‘হাজারে আসওয়াদ’ তথা ‘কৃষ্ণ প্রস্তর’টি স্থাপন করার মহা গৌরব অর্জন করবেন তা নিয়ে। এ ব্যাপারে ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি চার বা পাঁচ দিন চললো।

সকলেই নিজে বা তাঁর গোত্র কৃষ্ণ প্রস্তরটি যথাস্থানে স্থাপন করার দাবীতে অনড়। সকলেরই এক কথা, এ কাজটি তাঁরাই করবেন। কেউই সামান্য ছাড় দিতেও তৈরি নন। সকলেরই একই কথা, একই জেদ। জেদ ক্রমাশয়ে রূপান্তরিত হল রেষারেষিতে। রেষারেষির পরবর্তী পর্যায়ে হচ্ছে রক্তারক্তি। এ ব্যাপারে রক্তারক্তি করতেও তাঁরা

পিছপা হবেন না। সকল গোত্রের মধ্যেই চলছে সাজ সাজ রব। শুরু হয়েছে অস্ত্রের মহড়া। একটু নরমপন্থীগণ সকলেই আতঙ্কিত কখন যে যুদ্ধ বেধে যায় কে তা জানে।

এমন বিভীষিকাময় এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বর্ষীয়ান নেতা আবু উমাইয়া মাখযুমী এ সমস্যা সমাধানের একটি সূত্র খুঁজে পেলেন। তিনি সকলকে লক্ষ্য করে প্রস্তাব করলেন যে, আগামী কাল সকালে যে ব্যক্তি সর্ব প্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবেন তাঁর উপরেই এ বিবাদ মীমাংসার দায়িত্ব অর্পণ করা হোক। সকলেই এ প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করলেন। আল্লাহর কী অপার মহিমা! দেখা গেল সকল আরববাসীর প্রিয়পাত্র ও শ্রদ্ধেয় আল-আমিনই সর্ব প্রথম মসজিদুল হারামে প্রবেশ করেছেন। নাবী কারীম (ﷺ) এর এভাবে আসতে দেখে সকলেই চিৎকার করে বলে উঠল :

هَذَا الْأَمِينُ، رَضِينَاهُ، هَذَا مُحَمَّدٌ،

আমাদের বিশ্বাসী, আমরা সকলেই এর উপর সন্তুষ্ট, তিনিই মুহাম্মাদ (ﷺ)।

তারপর নাবী কারীম (ﷺ) যখন তাঁদের নিকটবর্তী হলেন তখন ব্যাপারটি সবিস্তারে তাঁর নিকট পেশ করা হল। তখন তিনি এক খানা চাদর চাইলেন। তাঁকে চাদর দেয়া হলে তিনি মেঝের উপর তা বিছিয়ে দিয়ে নিজের হাতে কৃষ্ণ প্রস্তরটি তার উপর স্থাপন করলেন এবং বিবাদমান গোত্রপতিগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, ‘আপনারা সকলে চাদরের পার্শ্ব ধরে উত্তোলন করুন। তাঁরা তাই করলেন। চাদর যখন কৃষ্ণ প্রস্তর রাখার স্থানে পৌঁছল তখন তিনি স্বীয় মুবারক হস্তে কৃষ্ণ প্রস্তরটি উঠিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন। এ মীমাংসা সকলেই হুঁচকিতে মেনে নিলেন। অত্যন্ত সহজ, সুশৃঙ্খল এবং সঙ্গত পন্থায় জ্বলন্ত একটি সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

এ দিকে কুরাইশগণের নিকট বৈধ অর্থের ঘাটতি দেখা দিল। এ জন্যই উত্তর দিক হতে ক্বাবাহ গৃহের দৈর্ঘ্য আনুমানিক ছয় হাত পর্যন্ত কমিয়ে দেয়া হল। এ অংশটুকুই ‘হিজর’ ‘হাতীম’ নামে প্রসিদ্ধ। এবার কুরাইশগণ ক্বাবাহর দরজা ভূমি হতে বিশেষভাবে উঁচু করে দিলেন যেন এর মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারে যাকে তাঁরা অনুমতি দেবেন। যখন দেয়ালগুলো পনের হাত উঁচু হল তখন গৃহের অভ্যন্তর ভাগে ছয়টি পিলার বা স্তম্ভ নির্মাণ করা হল এবং তার উপর ছাদ দেয়া হল। ক্বাবাহ গৃহের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে একটি চতুর্ভুজের রূপ ধারণ করল। বর্তমানে ক্বাবাহ গৃহের উচ্চতা হচ্ছে পনের মিটার। কৃষ্ণ প্রস্তর বিশিষ্ট দেয়াল এবং তার সামনের দেয়াল অর্থাৎ দক্ষিণ ও উত্তর দিকের দেয়াল হচ্ছে দশ দশ মিটার। কৃষ্ণ প্রস্তর মাতাফের জায়গা হতে দেড় মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। দরজা বিশিষ্ট দেয়াল এবং এর সাথে সামনের দেয়াল অর্থাৎ পূর্ব এবং পশ্চিম দিকের দেয়াল বার মিটার করে। দরজা রয়েছে মেঝে থেকে দু’মিটার উঁচুতে। দেয়ালের পাশেই চতুর্দিকে নীচু জায়গা এক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত চেয়ার সমতুল্য অংশ দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে যার উচ্চতা পঁচিশ সেন্টিমিটার এবং গড় প্রস্থ ত্রিশ সেন্টিমিটার। একে শাজে বওয়া (চলন্ত দুর্লভ) বলা হয়। এটাও হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে বায়তুল্লাহর অংশ। কিন্তু কুরাইশগণ এটাও ছেড়ে দিয়েছিলেন।[1]

ফুটনোট

[1] বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ১৯২-১৯৭ পৃঃ ফিরকহুস সীরাহ ৬২ পৃঃ সহীহুল বুখারী মক্কার ফযীলত অধ্যায় ১ম খন্ড ২১৫ পৃঃ, তারীখে খুযরী ১ম খন্ড ৬৪-৬৫ পৃঃ।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6078>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন